তারিখ ... 17 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম 6 ...

করপোরেট দাস তৈরির শিক্ষা!

সমাজ | জয়া ফারহানা

কলাম লেখক

শহর কলকাতা। আঠারো শতক। এ এমন এক সময় যখন কলকাতার শিক্ষার অতুল ঐশ্বর্য অধিকাংশ পরিবারের অন্দরমহলে প্রবেশ করেনি। জীবন চলে অমাবস্যা-পূর্ণিমার হিসাব কষে। অপেক্ষাকৃত উচ্চবংশের উচ্চশিক্ষিত সন্তানরা অহঙ্কারী, উদ্ধত, দুর্বিনীত। ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। তবে তা দেখতে হলে তাকাতে হবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দিকে। কলকাতাবাসীর কাছে এটা ঋষি বাড়ি হিসেবে পরিচিত। প্রতিভা, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞা, মনীষার আশ্রয়ভূমি। কেন্দ্রে আছেন প্রবাদপ্রতিম ঋষি পুরুষ দেবেন্দ্রনাথ। বেদ উপনিষদ, গীতার দর্শনের সঙ্গে যিনি মিলিয়েছেন হাফিজ ও খৈয়ামের মতো সাধকদের দর্শন। পেয়েছেন মহর্ষি উপাধি। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অভয়ারণ্য জোড়াসাঁকোর এই বাড়িতে মিলেছেন বহু বিচিত্র গুণী। আছেন অঙ্কশাস্ত্রের কালোত্তীর্ণ তাত্ত্বিক দ্বিজেন্দ্রনাথ, যুগন্ধর ডাকসাইটে আমলা সত্যেন্দ্রনাথ। আছেন অভিজাত ভারতী পত্রিকার সম্পাদক হেমেন্দ্রনাথ, শিল্প সমঝদার, নাট্যকার ও চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বিদুষী কবি স্বর্ণকুমারী দেবী। ভাবনা কেবল একজনকে নিয়েই। পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র সে। না, ছেলেটির গায়ের রঙ আর সব পুত্র-কন্যার মতো গৌর বর্ণের, আর না আছে লেখাপড়ায় মনোযোগ। বাড়ির অন্য ছেলেরা যখন পড়ার সময় ঘুম পেলে, ঘুম তাড়ানোর জন্য চোখে নস্যি ঘষে, এই ছেলেটিকে তখন মূর্খ হয়ে থাকার বিশ্রীরকম ভয় দেখিয়েও জাগিয়ে রাখা যায় না। সমবয়সী ছেলেরা যখন অঙ্ক আর বিজ্ঞানের কঠিন পাতা থেকে চোখ তুলতেই ফুরসত পায় না, এই ছেলেটির চোখ তখন বাড়ির সামনের অনাহূত বাদাম গাছটির পাতায় পাতায়। সকাল ৯টার নাশতায় সমবয়সী ছেলেরা যখন মাখন-রুটি পেয়ে তুষ্ট, এই ছেলেটি তখন উৎকর্ণ হয়ে থাকে কাঁচা আমওয়ালার মন উদাস করা ডাক শোনার জন্য। মাখন-রুটির চেয়ে কাঁচা আম থেকে ভালো লাগে তার। দুপুরের কড়া রোদে বাড়ির আর ছেলেরা যখন অসুখ-বিসুখ এড়াতে জমিয়ে ঘুমাচ্ছে, এই ছেলেটি তখন চৈত্রের নিদাঘ রোদে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ বারান্দার রেলিং ধরে অবাক তাকিয়ে আছে তো আছেই। একটানা এভাবে কখনও নালার জলের দিকে তাকিয়ে থাকা, মাছগুলো কীভাবে উল্টোদিকে সাঁতার কাটার কসরত করছে তা দেখা, কখনও আবদুল মাঝির সঙ্গে কল্পনায় দিঘিতে মাছ ধরতে যাওয়া...। দেখে দেখে জোড়াসাঁকোর বনেদি পরিবারের আর সবার কপালে চিন্তার ভাঁজ। না জানি কী কঠিন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে এর কপালে! আবদুল মাঝি আর ব্রজেশ্বরের সঙ্গেই যত গল্প কি-না এর। কার্তিক মাসের খোলা ছাদে সারারাত শুয়ে থাকে ছেলেটি। আশা, ভাগ্যক্রমে যদি জ্বর আসে এবং সেই সুবাদে পরদিন স্কুলে যাওয়ার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়! স্কুলের বাঁধাধরা রুটিন ক্লাসের চেয়ে এই গল্প যে কত ভালো! আরও ভালো, কোনো শখের যাত্রাদলের পালা দেখা। এমনকি খাদা নাকওয়ালী কোনো পাহাড়ি মেয়েকে অলসমনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখাও স্কুলে যাওয়ার চেয়ে ভালো। চারপাশে দেখার মতো কত কী আছে। এই যে কেমন হঠাৎ চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে ঝুপঝুপ ! কখনও এই বৃষ্টির শব্দ রিমঝিম। বজ্র বাজে ঝনঝন। বাতাস বয় হুহু। স্যাকড়া গাড়ির আওয়াজ কেমন খড়খড়। জাতা দিয়ে ডাল ভাঙছেন পিসিমা, সেই ভাঙা ডালের খুদগুলো দু'হাতে নিয়ে লেজের ওপর ভর দিয়ে কাঠবিড়ালি কেমন কুটুস কুটুস খাচ্ছে, সবকিছু খুব নিবিড়ভাবে অনুভব করতে ভালো লাগে। প্রকৃতির কাছে গেলে যে অবিমিশ্র সুখ আর কোমল বিষাদ কিশোর মন জড়িয়ে ধরে, সেই আনন্দ কি আর কিছুতে পাওয়া যায়?

এতক্ষণে নিশ্চয়ই সকলে বুঝেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সহজিয়া সম্পর্কের এই ছেলেটিই রবীন্দ্রনাথ। যিনি বলেছিলেন, হৃদয়কে স্বাস্থ্যবান রাখতে এবং কল্পনাকে শিক্ষিত করতে প্রত্যেকটি মানুষকে প্রকৃতির কাছে যেতে হবে। বিশ্বভারতীর খ্যাতি তখন ছড়িয়ে গেছে ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে ইউরোপ-আমেরিকায়। প্রতিষ্ঠানের এক উৎসবের দিনে তিনি বললেন, 'শিশুকাল থেকে আমি পলাতক ছাত্র। মাস্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে গেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের কত অদৃশ্য মাস্টারই যে প্রতিদিন আমাকে আমার অলক্ষ্যে পাঠ শিখিয়েছেন। ইটকাঠের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সেই পরিচয় যে কত মূল্যবান ছিল! সকালে কুঠির পানসি দক্ষিণ দিকে যেত, সন্ধ্যায় হতো উত্তরগামী। নদীর দু'ধারে জনতার ধারা, জলের ধারার সঙ্গে জীবনের এই যোগ, জলের সঙ্গে সূর্যের উদয়াস্ত বিশ্ব জগতের মহিমা বুঝতে শিখিয়েছে আমাকে। দীর্ঘদিন আমি পদ্মা তীরে থেকেছি। পদ্মা তটের সেই আম-জাম-ঝাউ-বেত, শর্ষের ক্ষেত, নানা গাছগাছালির গন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস, নির্জন চরে বুনো হাঁসের বসতি, সন্ধ্যার আকাশে জ্বলজ্বল তারা, নদীর স্বচ্ছ গভীরতা, এরাই আমার নিবিড় আত্মীয়।' ছোটবেলায় এত নিবিড়ভাবে নদী দেখেছিলেন বলেই বড় হয়ে বুঝেছিলেন, নদী কেন পুণ্যবান। নদী পুণ্যবান; কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে নদী। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে বলেছিলেন, লেখাপড়া আমি বিশেষ কিছু জানি না, ছেলেদের শিক্ষার ভার নেওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই। এখানে এদের এনেছি শান্তিনিকেতনের গাছপালা, পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। অ্যান্ড্রুজ আর পিয়ারসনের মতো গুণী-শিক্ষকও কিছু শেখাবে। তবে সেই শিক্ষা হবে তপোবনে নিভৃত তপস্যার মতো শিক্ষার সাধনা। প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্য যেমন সাধনক্ষেত্রে মিলিত হতেন, তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে চালু রাখা যায়, যদি জীবনের লক্ষ্য কী, এই প্রশ্নের মীমাংসা এখানকার শিক্ষার মাধ্যমে ছেলেরা পায়, তাহলেই তাদের শিক্ষা পূর্ণতা পাবে। বিশ্ব প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষা দেওয়ার যে ব্যবস্থা ভারতবর্ষে চালু হয়েছে, তাতে এরই মধ্যে শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়ে গেছে। আমি খুব প্রবলভাবে অনুভব করেছি যে, শহরের জীবনযাত্রা আমাদের চারদিকে যন্ত্রের প্রাচীর তুলে দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। এই আশ্রমে প্রকৃতির প্রাণ নিকেতনের খোলা হাওয়ায়, বসন্ত-শরতের পুষ্পোৎসবে প্রকৃতিমাতা যে অমৃত প্রদান করেন, সেই অমৃতের সঙ্গে সঙ্গীতের সম্মিলনে যে শিক্ষা, সেটাই আমি দিতে চাই ছেলেদের। আরেকটি কথাও অনেকদিন থেকে আমাকে ভাবাত, তা হলো ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্ক। ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্কের মধ্যে যদি অর্থ ঢুকে যায়, তবে সেই সম্পর্ক খুব হতভাগ্য সম্পর্ক। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক শিক্ষা দান করলে তা কেবল শুষ্ক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সম্পর্কের সেতুটি হওয়া উচিত ভক্তি-স্নেহের। এখানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হবে ভক্তি-স্নেহের। বিদ্যাশিক্ষায় কোনো জাতি-বর্ণের ভেদ নেই। জন্মসূত্রে যে শিক্ষা মানুষ পায়, তা কোনো এক জাতির দান নয়। কালে কালে নিখিল মানবের সমস্ত ধর্মের, সমস্ত দর্শনের, সমস্ত কর্মের, মন্ত্রের মধ্যেই শিক্ষার প্রাণশক্তি। পরীক্ষার ফললাভ ছোট কথা। আসল ফল শিক্ষার্থীর মন জাগাতে পারা গেল কি-না, তার আত্মশক্তি উদ্বোধন হলো কি-না, প্রকৃতির শুশ্রূষায় তার মন আনন্দিত হলো কি-না, প্রকৃতিকে শিক্ষার্থীরা অনুভব করতে পারল কি-না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষার্থীদের যোগসূত্র তৈরি হলো কি-না।

শিশুরা এখানে দৌড়াবে, গাছে চড়বে। হাসি গান আনন্দ এবং গল্পের ছলে যা শিখবে তাতেই এদের মন পুষ্টি পাবে। পাসের জন্য পরীক্ষকরা কোনো নম্বর দিতে পারবেন না। আমি জানি, অভিভাবকরা এতে রাজি হবেন না। কিন্তু প্রকৃতির আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে যে কৃত্রিম শিক্ষা বিদ্যা, আমি সেই কারাগার থেকে মুক্তি দিতে চাই। মুক্তির উপায় প্রকৃতিকে শিক্ষার ধাত্রী বলে স্বীকার করে নেওয়া। আজ থেকে এই আদর্শ নিয়েই এই শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হলো। বণিক বাণিজ্য বিস্তার করুক, ধনী ধন সঞ্চয় করুক; কিন্তু এখানে সর্বমানবের যোগ সাধনের সেতু রচিত হবে। এই মিলনক্ষেত্রের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আমরা সব ধর্মের মানুষকে আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হবো না।

বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে যে প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। প্রতিদিন কত ধনীর ধনসম্পদ আবর্জনা হয়ে নর্দমায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে কেউ তার হিসাব মেলাতে পারে না। কিন্তু বিশ্বভারতী সর্বদেশের সর্বকালের চিরন্তন সম্পদ হয়ে আছে। সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো জাহাজের বিশাল শিল্পপতি হননি বলে, বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো অঙ্ক শাস্ত্রের ফিলোসফার হননি বলে, মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের মতো বিখ্যাত আমলা হতে পারলেন না বলে, ঠাকুরবাড়ির নাম ডোবানোর আশঙ্কা ছিল তাকে নিয়ে।

যে শিশু-কিশোররা কেবল মন ও প্রাণের আনুগত্য স্বীকার করে, যারা চারপাশের নদী, গাছ, পাখি, ঝর্ণা, প্রকৃতিকে ডাকঘরের অমল কিংবা অমলকান্তির মতো ভালোবাসে, আকাশের শেষ প্রান্ত থেকেও যারা পাখির ডাক শুনতে পায়, সেই অমল এবং অমলকান্তিদের প্রতিনিয়তই কত বকাঝকা না শুনতে হয়। এরা বোকা, পিছিয়ে পড়া এবং যথেষ্ট স্মার্ট নয়! এভাবে কত ভবিষ্যৎ রবীন্দ্রনাথকে না হত্যা করছে করপোরেট পুঁজির দোকানদার বানাতে চাওয়া অভিভাবকরা!

যে শিশু-কিশোররা কেবল মন ও প্রাণের আনুগত্য স্বীকার করে, যারা চারপাশের নদী, গাছ, পাখি, ঝর্ণা, প্রকৃতিকে ডাকঘরের অমল কিংবা অমলকান্তির মতো ভালোবাসে, আকাশের শেষ প্রান্ত থেকেও যারা পাখির ডাক শুনতে পায়, সেই অমল এবং অমলকান্তিদের প্রতিনিয়তই কত বকাঝকা না শুনতে হয়। এরা বোকা, পিছিয়ে পড়া এবং যথেষ্ট স্মার্ট নয়! এভাবে কত ভবিষ্যৎ রবীন্দ্রনাথকে না হত্যা করছে করপোরেট পুঁজির দোকানদার বানাতে চাওয়া অভিভাবকরা!